গুঞ্জন

নববর্ষ আনে নতুন আশা ও সংকল্প। কিন্তু, নববর্ষকে বরণ করা উচিত বিভিন্ন প্রগতিশীল পরিকল্পনার মাধ্যমে। বিশ্বের প্রতিটি দেশ যেরকম একই আনন্দের জোয়ারে মাতোয়ারা হয়ে এই দিনটিকে স্বাগত জানায়, ঠিক তেমনভাবেই যদি প্রতিটি মানুষ মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে সারা বিশ্বেই ঘটবে অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও শৈল্পিক উন্নতি। এই ইতিবাচক স্বপ্ন নিয়েই, চলুন এগিয়ে চলি...

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ৩, সংখ্যা ৮
জানুয়ারি ২০২২

নবীন আশা সংখ্যা

কলম হাতে

ডাঃ অমিত চৌধুরী, ডঃ মালা মুখার্জী, রিয়া মিত্র, পিনাকী বিশ্বাস, পল্টু ভট্টাচার্য, শান্তিপদ চক্রবর্ত্তী, দেবী প্রসাদ চৌধুরী এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

@Pandulipi

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

পাণ্ডুলিপির সকল শুভাকাঙ্ক্ষী ও সুহৃদ বন্ধু, লেখক-লেখিকাগণ আর একনিষ্ঠ পাঠক-পাঠিকাদের জানাই ইংরেজি নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা। নতুন বছর সকলের ভালো কাটুক। সকলের জীবন সুস্থ ও সুন্দর হয়ে উঠুক।

নতুন বছরে গুঞ্জনের পাতাকে পুরাতন লেখকদের পাশাপাশি নতুন নতুন লেখকদের লেখা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। আর সাথে পুনরায় সাজিয়ে তোলা হচ্ছে আরও কিছু নতুন বিভাগ সংযোজন ও পরিমার্জন করে।

নতুন বছরে 'গুঞ্জন' জানুয়ারি ই-পত্রিকা সংখ্যায় 'খেলার দিগন্ত' সংযোজন করা হয়েছে। আরও অন্যান্য বিষয় ভিত্তিক প্রবন্ধ কিংবা নিবন্ধ সংযোজন করা হবে পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে।

পাণ্ডুলিপির যেসব সদস্যরা অঙ্কন শিল্পে পারদর্শী, তাঁরা সত্বর নিজেদের শিল্প কর্ম আমাদের পাঠাতে পারেন। সেই অঙ্কনের সাথে গপ্প-সপ্প জুড়ে গড়ে তোলা হবে কমিক্স বিভাগ। তাই উৎসাহী চিত্রকররা আপনাদের অঙ্কন পারদর্শিতা 'গুঞ্জন'-এর পাতায় ফুটিয়ে তুলতে এগিয়ে আসুন পাণ্ডুলিপির পাশে। আশা করছি আগামী দিনে 'গুঞ্জন' খুঁজে পাবে নতুন নতুন শিল্পীর হস্ত নৈপুণ্যের স্পর্শ।

সবাই সুস্থ থাকুন ও ভালো থাকুন। ■

বিনীতাঃ রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা), সম্পাদিকা, গুঞ্জন

বিনীতঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে), নির্বাহী সম্পাদক, গুঞ্জন

কলম হাতে

কলম হাতে

কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য

আমাদের ‘ই-মেল’-এ বেশ কিছু একই ধরণের প্রশ্ন বার বার ঘুরে ফিরে আসছে, যার উত্তর প্রতি প্রেরককে পৃথক ভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই লেখক-লেখিকারা নীচের বিষয়গুলির ওপর মনোযোগ দিলে ভাল হয়।

- ‘গুঞ্জন’-এ পাঠান লেখা অনুমোদিত হলে তা তিন মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। কোন কারণে তার বেশি দেরি হলে আমরা ই-মেল-এর মাধ্যমেই জানাই।
- যদি কোন লেখক বা লেখিকা শুধু তাঁর প্রকাশিত লেখাটি কেটে ‘ইন্টারনেট’ মাধ্যমে ‘শেয়ার’ করেন, তাঁর লেখা আমরা আর নিতে চাইনা। অন্য জায়গায় প্রকাশিত লেখাও আমরা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক।

ধন্যবাদ।

নতুন বছর নতুন আশা

গোবিন্দ মোদক

নতুন বছর সঙ্গে করে আনলো নতুন আশা,
গাছেরা তাই ফুল ফোটালো, রঙিন ভালোবাসা।
উড়ে এলো সাইবেরিয়ার অচিন কোনও পাখি,
তাকে দেখে ময়না শুধায় আমায় চেনো না কি!

পরিযায়ী মনের সাথে মেলে নতুন মন,
বন্ধুত্ব, বিশ্বাস আর ভালোবাসার ক্ষণ।
সেই ক্ষণের-ই স্পর্শ নিয়ে জাগে নবীন আশা,
মরশুমি সব রঙিন ফুলে ছড়ায় ভালোবাসা।

হু হু হাওয়া শনশন বয় সেই উত্তর থেকে,
বন্ধুত্বের আড়াল দিয়ে বিপদ রাখে ঢেকে।
পথ চলাতে বন্ধু লাগে, লাগে স্পর্শ তার,
ভালোবাসা না থাকলেই জগত অন্ধকার।। ■

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ চল ফিরি বিদ্যালয়ে...

শিল্পীঃ রিত্বিকা চ্যাটার্জি ✧ বয়সঃ ১২ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

বিশেষ ঘোষণা

গুঞ্জনে প্রতি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্তই পরের (মাসের) সংখ্যার জন্য লেখা গ্রহণ করা হয়।

গুঞ্জন পড়ুন ~ গুঞ্জন পড়ান

নমামি দেবী নর্মদে

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

পঞ্চম পর্যায় (৫)

২৪ শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বেরিয়ে পড়েছি সকাল ছয়টায়। সকাল থেকে কুকুরটিকে আর দেখতে পাচ্ছি না। আজ শিবরাত্রি। তাই নর্মদা তটের এই গ্রামগুলি সেজে উঠেছে নতুনভাবে। একটি শিব মন্দির থেকে আমাদের ঠান্ডা জল মিষ্টি খাওয়ানো হল। দোকানে চা-খেলে পয়সা নিচ্ছে না। উল্টে ১০ টাকা করে প্রণামী দিচ্ছে, এ এক আজব ব্যাপার! যাই হোক, এগিয়ে চলেছি। এবার মাঠের পথ ধরে চাষের জমি, জঙ্গল, পাহাড়ী টিলা ভেঙে চলেছি। রাস্তা খুব সুখকর নয়। তার উপর সূর্যের তাপ। অসহনীয় অবস্থা। হঠাৎ দেখি মটর বাইকে করে লম্বা একটি লোক এসে বাংলায় জানতে চাইল, "আপনারা কোথায় যাবেন?" বাংলায় কথা বলছে শুনে খুব উৎসাহিত হলাম। লোকটি হোসেঙ্গাবাদে থাকে, আর এখানে মাছের ব্যাবসা করে। সে জানাল কোকসার গ্রামটি বেশি দূর নয়।

প্রায় এক ঘণ্টা যাওয়ার পর নর্মদার দর্শন পেলাম। এখানে কেবলারী নদীর সাথে নর্মদার মিলন হয়েছে। গ্রামটির নাম কোকসার। স্নানের সময় সঞ্জয় দু'টি শিবলিঙ্গ পেল। স্নান করে এলাম গৌরীশঙ্কর ভারতীর সমাধিস্থলে।

নমামি দেবী নর্মদে

শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে কিছু ধণাঢ্য ব্যক্তি কুমারী পুজোর আয়োজন করেছেন। আন্তরিকতার থেকে আড়ম্বরতাই বেশি। এত পবিত্র জায়গায় এই পরিবেশ ভালো লাগল না। তাই আমার মধ্যাহ্ন ভোজন করতে ইচ্ছা করল না। হয়তো এটাই মায়ের ইচ্ছা। আমাদের এবারের মতো পরিক্রমা এখানেই শেষ।

গৌরীশঙ্করজীর অখন্ড ধুনীতে হোম করার সুযোগ পেয়ে গেলাম। এখান থেকে বিকাল চারটের সময় একটি অটো করে বাইশ কিলোমিটার দূরে হোসেঙ্গাবাদে আমাদের পুরানো আস্তানা নাগেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে এসে উঠলাম। আসার পথে রামজী বাবার সমাধিস্থল দর্শন হোল, এবং আরো কয়েকটি মন্দির দর্শন করলাম। শিবরাত্রির জন্য সর্বত্রই ভীষণ ভীড়।

নর্মদার দিকে মুখ করা একটি ঝুল বারান্দায় মহারাজ আমাদের থাকতে দিলেন। সন্ধ্যে হতেই মন্দিরগুলির রূপ বদলে গেল। আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে নর্মদার দু'পাড় ধরে। আজ যে শিবরাত্রি। শিব-দুহিতা তাই নতুনভাবে সেজে উঠেছে। নবকলেবরে শিব মন্দিরগুলিও মেতে উঠেছে। বৈদিক মন্ত্র এবং শিবস্তুতিতে ভরে উঠেছে প্রতিটি মন্দির। সন্ধ্যারতি করে নাগেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করতে গেলাম। পুরোহিত মশাই আমাকে বললেন, "আপনি পরিক্রমাকারী, তাই আপনাকে আগে অভিষেক করিয়ে অন্য কাজ শুরু করব।" আমাকে মন্দিরের গর্ভ গৃহে নিয়ে

এসে বসালেন। আনুমানিক তিন ঘণ্টা এই প্রক্রিয়া চলার পর আমরা নীচে ঝুল বারান্দায় এসে বসলাম। এরই মাঝে কখন কাকাজী আর সঞ্জয় রুদ্রাভিষেকে এসে বসেছেন বুঝতে পারিনি। নর্মদার দিকে তাকিয়ে বসে আছি। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম – কালো কম্বল গায়ে দিয়ে একটি দিব্য দেহী নাগা সন্ন্যাসী আমার পাশে বসে জানতে চাইলেন কুমারী পুজো করেছি কি না? আমি না বলাতে, উনি আমার হয়ে করে দেবেন বললেন। আমি কিছু টাকা দিলাম। উনি আমাকে ঝোলা থেকে বার করে একটি পাঁচমুখী রুদ্রাক্ষ আশীর্বাদ স্বরূপ দিলেন।

এদিকে একটি প্রবাদ আছে, ‘দেবতা কি প্রসাদ বাঁটো লেকিন সাধু কি প্রসাদ খুঁদ সাঁটো।’ আমার এক সঙ্গী রুদ্রাক্ষটি চাইলেন। কিন্তু এই প্রবাদটি বলে তাঁকে শান্ত করলাম।

নর্মদে হর।

...ক্রমশ ■
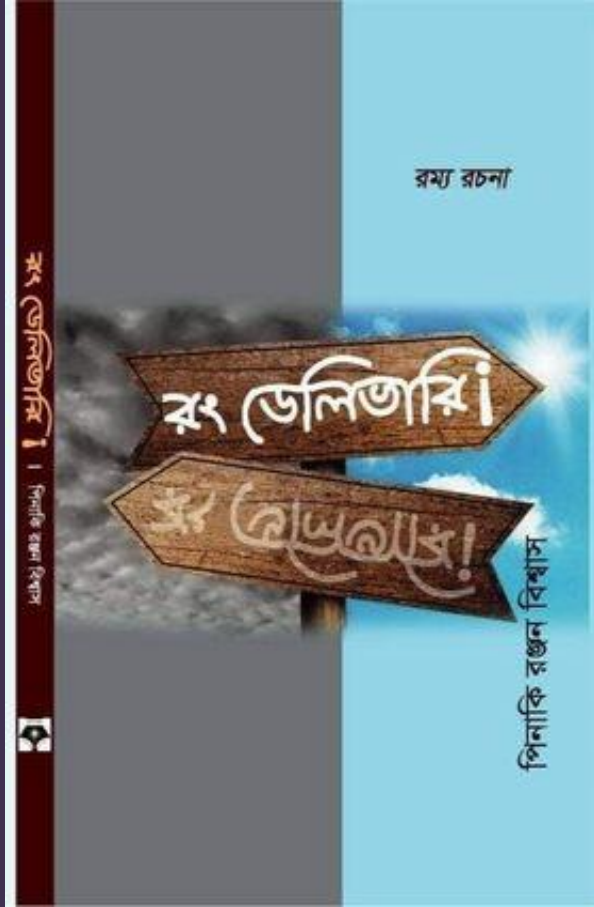
ওয়ান্ডারার্সে প্রথম হার

সুজন ভট্টাচার্য

সদ্য পরাজয় বরন করা টেস্ট ম্যাচের আগে ভারত জোহানেসবার্গে মোট পাঁচটি টেস্ট খেলেছিল। দু'টিতে জিতেছিল এবং তিনটি ড্র করেছিল। ওয়ান্ডারার্সে তাদের এই প্রথম হারটির কারণ ছিল ঋষভ পান্তের হারা-কিরি, একটি ছিদ্রযুক্ত মিডল-অর্ডার, এবং বিরাট কোহলির অনুপস্থিতিসহ বেশ কয়েকটি।

কোহলির অনুপস্থিতি

ভারত শুধু বিশ্বাসঘাতক পিচে তাদের সেরা ব্যাটসম্যানকে মিসই করেনি, তারা অধিনায়ক হিসেবে তার তীব্রতা থেকেও বঞ্চিত ছিল। এমনকি একটি দীর্ঘ নিষ্ফলা সময়ের মধ্যেও কোহলি ৩০ এবং ৪০ স্কোর করে চলেছেন। তাছাড়া একজন দলনেতা হিসাবে তিনি কঠিন পরিস্থিতিকে উপভোগ করেন, যেমনটি ২০১৮ সালে ওয়ান্ডারার্সে দক্ষিণ আফ্রিকার এবং সম্প্রতি গত বছর লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের জয়ের সময় স্পষ্ট হয়েছিল।

কোহলির অনুপস্থিতি স্পষ্ট অনুভব করা যাচ্ছিল যখন জোহানেসবার্গ টেস্ট ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা জয়ের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মাঠে ভারতীয়দের কাঁধ ঝুঁকে

পড়ছিল। কেউই ডিন এলগারকে চোখে চোখ রেখে ভীতি প্রদর্শন করার চেষ্টা করেনি। প্রোটিয়ারা ২০০ পেরিয়ে যেতেই ভারত একটি গতির মধ্য দিয়ে যেতে শুরু করে। সুতরাং বিরাট কোহলির অনুপস্থিতি ওয়ান্ডারার্সে সত্যিই একটা বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পান্তের হারা-কিরি

চিতেশ্বর পূজারা এবং অজিঙ্কা রাহানে তাদের কেরিয়ারের জন্য এবং, আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, দলের হয়ে খেলার জন্য নিয়ত লড়ে যান। তাঁরা শরীরে আঘাতের পর আঘাত নেন কিন্তু দমে যাননি। তারপরেই ক্রিজে আসেন পান্ত। আর যখনই কাজীসো রাবাদা উনাকে বাউন্সার দিয়ে নরম করে ফেলেন, তখনই তিনি ট্র্যাক থেকে নেমে একটি কদর্য শট মারতে উদ্যত হন, এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই প্যাভিলিয়নে ফিরে যান।

ভঙ্গুর মিডল অর্ডার

প্রথম ইনিংসে মিডল অর্ডারের বিপর্যয়ও এই খেলায় ভারতকে অনেক মূল্য দিতে বাধ্য করেছে। পূজারা, রাহানে এবং হনুমা বিহারির মধ্যে মাত্র ২৩ রান হয়েছিল, কারণ সফরকারীরা এক পর্যায়ে ৪৯/১ থেকে ৯১/৪-এ নেমে গিয়েছিল। প্রথম টেস্টেও ভারতের মিডল অর্ডার ঠিকঠাক নিজেদের কাজ করতে পারেনি। কিন্তু রাহুলের সেঞ্চুরি এবং মায়াঙ্ক আগরওয়ালের হাফ সেঞ্চুরি তাদের জয়ের পথ তৈরি

করেছিল। ওয়ান্ডারার্সে, প্রথম দফায় রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ব্যাট হাতে প্রতিরোধ এবং দ্বিতীয়টিতে পূজারা এবং রাহানের লড়াই ছাড়া ভারতের উল্লেখ্য কোনো প্রতিরোধ ছিল না।

নিম্নমানের ক্যাচিং

এটি একটি পুনরাবৃত্ত থিম হয়েছে। পান্তের ড্রপ করা ক্যাচটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছিল – যেমন শার্দুল ঠাকুর টেম্বা বাভুমার ক্যাচ-এন্ড-বোল্ডের সুযোগ ধরে রাখতে ব্যর্থ হন এমন একটি সময় যখন বাভুমা তার হিসাবের খাতাটুকু খুলতে পারেনি। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং লাইন-আপের শেষের দিকের দুর্বলতা এবং বাভুমা সিরিজে, এলগারের ছাড়া, তাদের সবচেয়ে ধারাবাহিক ব্যাটসম্যান থাকাতে এটি একটি ব্যয়বহুল ক্যাচ ড্রপ ছিল। ১৮০-এ ৩ উইকেট এবং ২৪০-র গন্তব্যস্থল তখনও বেশ কিছুটা পথ। তারমানে তখনও ম্যাচটি দু'টো দলের জন্যই অনেকটা বেশ খোলা ছিল। গত মৌসুমে অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারত ৩০টির বেশি ক্যাচ ফেলেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে প্রথম টেস্টেও দুজনের ক্যাচ ফেলে দিয়েছিলেন তারা।

হেভি রোলিং-এর সুবিধা

পরিবর্তনশীল বাউন্স এবং কিছু দৃশ্যমান ফাটল সহ একটা পিচে, প্রোটিয়ারা তৃতীয় দিনে তাদের চেজ শুরু করার আগে এবং চতুর্থ দিনের শেষে, ব্যাক-টু-ব্যাক হেভি

রোলার ব্যবহার করার সুবিধা উপভোগ করেছিল। ভারী রোলারের ব্যবহার অন্তত এক ঘন্টার জন্য পিচকে স্থির করে, পিচের দানবিকভাবটাকে নির্মূল করে দিয়েছিল। তাই দক্ষিণ আফ্রিকা দল এক সাথে উইকেট হারানো এড়াতে সক্ষম হয়েছিল।

সিরাজের চোট

প্রথম দিনে হ্যামস্ট্রিং স্ট্রেনের কারণে এই টেস্টে মোহাম্মদ সিরাজ কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়েন। তিনি দ্বিতীয় দিনে কিছুটা বল করতে ফিরে আসেন, কিন্তু তিনি ১৩০ কে.পি.এইচ. (kph) গতির উপরে বল করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। তিনি প্রথম ইনিংসে মাত্র ৯.৫ ওভার এবং দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ছয় ওভার বল করতে পেরেছিলেন। তাঁর স্বাভাবিক ইনকামিং ডেলিভারির মাধ্যমে, একজন সম্পূর্ণ ফিট সিরাজ এলগারকে আরও কঠিন মোকাবেলায় আমন্ত্রণ জানাতে পারতেন।

রাহুলের অধিনায়কত্ব

রাহুল সম্ভবত প্রথমবারের মতো ভারতকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতির সময় পাননি, কারণ কোহলির পিঠের আঘাতের কারণে দ্বিতীয় টেস্ট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি খেলা শুরুর মাত্র কয়েক ঘন্টা আগেই এসেছিল। প্রথম ইনিংসে একটি ভাল হাফ সেঞ্চুরির মাধ্যমে উনি এটা দেখাতে পেরেছিলেন যে অতিরিক্ত দায়িত্বের চাপ

ওনার ব্যাটিং-এর ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। কিন্তু চাপের মধ্যে, বিশেষ করে দ্বিতীয় ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার রান তাড়া করার সময়, তাঁর অধিনায়কত্ব কাঙ্ক্ষিত মান থেকে অনেকটাই নিম্নস্তরে থেকে যায়।

চতুর্থ দিনের খেলাটি বৃষ্টির জন্য দেরিতে শুরু হয়েছিল। মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় খেলা আবার শুরু হলে অধিনায়ক রাহুল দলের একমাত্র সুইং বোলার শার্দুলকে, যিনি প্রথম ইনিংসে সাত উইকেট পাবার পর অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠে ছিলেন, প্রথম ব্যবহার করার সুযোগ হাতছাড়া করে ফেলেন। অবশেষে নয় ওভার খেলার পরে যখন তাঁকে আনা হয়েছিল ততক্ষনে দক্ষিণ আফ্রিকা বিজয়ের ঢলে নিজেদের ঢেলে নিয়েছিল। যখন পিচের উপরের মাটিতে আর্দ্রতা সহ একটি সুন্দর ছন্দে স্থির হয়ে উঠছিলেন তখনই মাত্র দুটি ওভার করিয়ে অশ্বিনকে সরিয়ে নেওয়াটাও সঠিক হয়নি। ■

‘গুঞ্জন’-এর ২০২২-এর আগামী সংখ্যাগুলির বিষয়বস্তু

ফেব্রুয়ারী – প্রেম সংখ্যা (কাজ চলছে)

মার্চ – নারী সংখ্যা

এপ্রিল – সংস্কৃতি সংখ্যা

মে – শ্রমিক দিবস সংখ্যা

পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ

মুল্যঃ ৮০ টাকা [অনলাইনে কুরিওর শুল্ক অতিরিক্ত]

রসিক পকেটমার

পল্টু ভট্টাচার্য

আমাদের পাড়ার কান্তদা প্রচন্ড শান্ত মানুষ। অন্য কথার চেয়ে রসের কথা নিয়েই বেশি মাতেন। তবে গোড়াতেই বলে রাখি, আর পাঁচজনের মতো চাকরি বা ব্যবসা তাঁর ভালো লাগে না, তিনি শিল্পচর্চা করতে ভালবাসেন। তবে মুশকিল হল, ওনার ঐ শিল্পটা জনসমক্ষে চর্চা করতে গেলে বেধড়ক ধোলাই আর থানা পুলিশের হাঙ্গামা। কি সুন্দর তার নাম 'হস্তলাঘব শিল্প'... হ্যাঁ, আপনারা ঠিকই ধরেছেন, পাতি ভাষায় পকেট মারা। এ যেন কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন।

তবে, কান্তদা এই শিল্পে দিনে দু'তিন ঘন্টার বেশি খরচ করেন না, বাকি সময়টা আমাদের সাথে আড্ডা মেরেই কাটান। তিনি কর্মকালীন যত পথচলতি রসের গল্প আমাদের প্রাণভরে শোনান। কান্তদার ভাষায়, শিল্পকার্যের জন্য চাই সঠিক পরিকাঠামো বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার।

যখন বেকার ছিলেন, তখন কান্তদার আলাপ হয় বাদল বাবুর সঙ্গে। বাদল বাবু বি. বা. দী. বাগে কাটা ছেঁড়া নোট বদলে ভালো টাকা দিতেন। কান্তদার মুখে "দাদা একটা কাজ হবে?" শুনে বাদল বাবু একটু থমকালেন। কান্তদাকে

বললেন, “হবে, তবে আমাদের কোচিং-এ চল।” এরপর মিনিট দশেক হেঁটে, দু’জনে একটা পুরনো বাড়ির উঠোনে হাজির হলেন...

একটা টেবিলে ভিজে ন্যাকড়া চাপা দেওয়া একটা আস্ত লাউকে দেখিয়ে বাদল বাবু বলেছিলেন, “এই নাও ব্লেড, এই ভিজে ন্যাকড়াটাকে কাট। কিন্তু লাউতে কোন দাগ এলে চলবে না। আশ্চর্য, এক বারেই কান্তদা সফল হলেন। বাদল বাবু বললেন, “লাইনে পুরনো মাল না কি?” কান্তদা বললেন, “না না খুব চাকরির দরকার আমার। এরপর যে কি হবে!”

– কি আবার হবে? পকেট মারবি। শোন লজ্জা পাসনা। এর কাব্যিক নাম ‘হস্ত লাঘব’ শিল্প। পকেটমারি নামটা কিরকম ছোটলোকের মত শোনায়, ঐ জন্যে আমি একে বলি ‘হস্ত লাঘব’ শিল্প।

তারপর আস্তে আস্তে, কান্তদা হয়ে গেলেন একজন সুপার পকেটমার। অনেকে জানলেও সত্যটা চেপেচুপেই রাখে।

কত অভিজ্ঞতা ভরা গল্পের স্টক যে আছে কান্তদার কাছে, তা বলে শেষ করা যাবে না। এক দিন আড্ডায় এসে কান্তদা বললেন, ‘দু’ট দশ, গালে ফেললেই রস। কি জিনিস বল দেখি?”

আমরা সবাই শুনে অবাক, কি হতে পারে! কান্তদা বললেন, “ওরে গাধা, টফি-লজেন্স। আমতা লাইনের লজেন্স

বেচার লোকটা বলে।" এই রকম অনেক মজার কথার চর্চা চলে রোজ।

কান্তদার পিসি হওয়ার সুবাদে, উত্তম কুমারের অন্ধ ভক্ত বিনি পিসি, আমাদেরও পিসি। একদিন বাসে উঠে, পিসির মানিব্যাগটা হাওয়া। কান্তদার দিকে চেয়ে, পিসি বললেন, "এই কান্ত তিরিশটা টাকা দেত, সন্ধ্যে বেলায় বাড়ি গিয়ে দিয়ে দেব। সন্ধ্যা বেলায় কান্তদার বাড়ি হাজির বিনী পিসি। কান্তদাকে খান কয়েক চর কসিয়ে পিসি বললেন, "গাধার বাচ্চা, নিজের পিসিকেও রেয়াৎ করিস না। কান্তদা বললেন, "স্যরি পিসি, ব্যাগটা নাও। এটুকু ঝাড়ে আমাদের কিছু হয় না। আমাদের ক্লাসে বস্তা বন্দী করে পেঁদায়। ধরা পড়লেই, রুট বদলাতে হয়। কখনও বাস, কখনও মেট্রো, কখনও অটো, কখনও টোটো...

এই কিছুদিন আগে, লক্ষ্মীকান্তপুর লোকালে এক নতুন বউয়ের হার আর কিছু টাকা হাওয়া। অনেক তোলপাড় করেও কিছু পাওয়া গেল না। কান্তদা আর টি. টি. মদনপুর স্টেশনে নামলেন। ট্রেন চলে যাবার পর টি. টি.–টা কান্তদার চোয়াল চেপে ধরল। কান্তদার মুখ থেকে একটা ভাঙা ব্লেড আর একটা সোনার হার বেরিয়ে এল। টি. টি.-টা বলল, "এদিকে আবার এলে খবর দিস।"

একদিন মেট্রোতে একটা ভাঙা পা-ওয়ালা যাত্রীর বুক পকেট থেকে কান্তদা একটা দামী মোবাইল ফোন ঝাড়ল।

ফোনটাকে চাঁদনীতে বেচতে গিয়েই, তিনি ঐ ভাঙা পা-এর লাথি খেলেন। লোকটা খিঁচিয়ে উঠল, "শুয়োরের বাচ্চা, লাইনের লোককেও চিনিস না, কি কাজ করিস?"

এইভাবে কান্তদা নানা ঝুট ঝামেলায় পড়েও বেঁচে যান। তবুও পেটের টানে কাজ করতেই হয়, থেমে থাকলে তো পেট মানবে না। কান্তদার রসবোধ তাঁর ক্লান্ত ও হতাশ মনকে আশা জোগায়।

এক দিন তিনি স্কুলের হেড স্যারের পকেট মেরেও ফেরত দিলেন। বললেন, "বুঝতে পারিনি স্যার।" হেড স্যার দুঃখ করে বললেন, "বাবা তুমি তো লেখাপড়ায় মোটামুটি ভালই ছিলে, শেষকালে পকেটমার হলে!" কান্তদা বললেন, "স্যার, আপনি তো বলতেন, পৃথিবীতে কোন কাজই ছোট নয়।" তারপর ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলেন কান্তদা।

##

বয়স বেড়েছে, কোন কিছুই আর ঠিকমত সাথ দেয় না। ছেলেমেয়েরা জানে যে কান্তদা দালালি করে খান, তবে 'চির দিন কাহারও সমান নাহি যায়..." কান্তদার ছেলে ভাল চাকরি করে, মেয়ের ভাল ঘরে বিয়ে হয়েছে, আজকাল কান্তদা লাইনটা ছেড়ে দিয়েছেন। চেনা পুলিশ, মস্তান, চোর সবাই টিটকিরি দেয়, তবু কান্তদার আর পা টলে না।

আসলে লোভ কম থাকলে, জীবনে অনেক কিছু করা যায়। কান্তদা সেদিনই বললেন, "এখন বড় ভাল আছি। তবু

তোদের বলি, আমাদের লাইনেও বড় শিল্প ঘাটতি চলছে এখন। তাই আমি চাই, ‘হস্ত লাঘব’ শিল্প এবার ভিন্ন পথে চালু হোক। আমার কাছে অনেক নামীদামী কাগজ আছে, যেমন ধর – ইন্দিরা গান্ধীর হাতের লেখা সার্টিফিকেট, শঙ্খ ঘোষের হাতে লেখা কবিতা, সুনীল গাঙ্গুলির হাতে লেখা উপন্যাস, জয় গোস্বামীর হাতে লেখা কবিতা ইত্যাদি। ওগুলো নিয়ে একটা প্রদর্শনী করব ভাবছি। প্রদর্শনীটার নাম দেব ‘রসিক পকেটমার’। আর উদ্বোধন করাব আমাদের স্কুলের হেড স্যারকে দিয়ে। তোরা কি বলিস?”

আমরা দেখলাম, কাল মেঘের ফাঁকে ঝকঝকে সূর্যটা ক্রমশ উঁকি দিচ্ছে। বাতাসে জুঁই ফুলের সুবাস... ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০১৯

http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/zczy/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/fyxj/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/ddla/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btss/
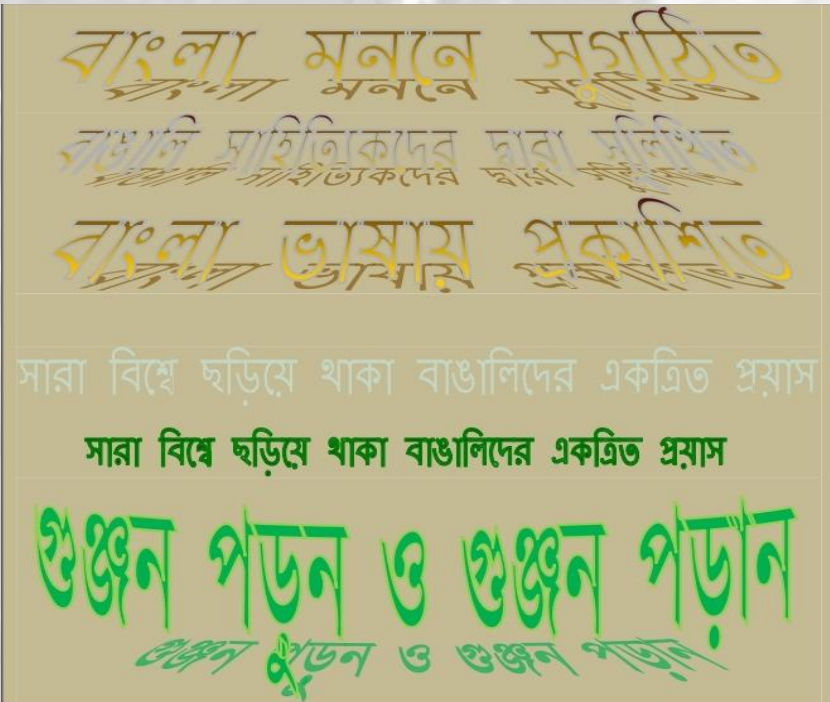
পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

ঐতিহাসিক

আকালী*

(অন্তিম পর্ব)

ডঃ মালা মুখার্জী

সুরা আর সুন্দরীর বন্যা বয়ে গেল রাজপুরীতে, গঙ্গাবক্ষে ভাসল লক্ষ লক্ষ প্রদীপ, আর আতসবাজির রোশনাইতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল আমজনতার। লর্ড হেস্টিংস বেশ প্রসন্ন হয়েছেন। এমন বিলাসীতা ইণ্ডিয়া ছাড়া আর কোথায় আছে? শুধু রাজঅতিথি দিওয়ান নন্দকুমার উশখুশ...

"মহারাজ চৈতসিংজী," দিওয়ান (মহারাজ) নন্দকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি বলেছিলেন যে জ্ঞানকূয়ো থেকে এক প্রাচীন কালীমূর্তি পাওয়া গেছে।"

"হ্যাঁ, দিওয়ানজী," চৈত সিং বললেন।

"আমি কালীভক্ত, আমি মায়ের বিগ্রহটি দর্শন করতে আগ্রহী। কিন্তু, আপনার প্রাসাদের কোথাও তো কালীপুজোর বিন্দুমাত্র আয়োজন দেখলাম না।"

"আসলে রাজপুরোহিতের কথানুযায়ী মনিকর্ণিকার মহাশ্মশানে মায়ের পুজো হচ্ছে। আমরা বৈষ্ণব, তাই রাজপুরোহিতের এই নিদান। আর সেই পুজোর তদারকি করছেন হোলকার রাজমাতা অহল্যাবাঈ। তাঁর ধারণা পাতালবাসিনী আকালীর পুজো না করা হলে পাতাল থেকে

বিশ্বনাথের শিবলিঙ্গ উঠবে না।” চৈত সিং হাসলেন, তাঁর এখনও রাজমাতার আস্থায় সন্দেহ রয়েছে। “কাপালিকগণ সেই ভীষণাদেবীর পুজো করবেন মধ্যরাত্রে।”

মহারাজ নন্দকুমার আগ্রহ করলেন, “আমি যাবো। আশা করি আপনার অনুমতি আছে।”

“তা আপনি যেতেই পারেন...”

“উই অলসো ওয়ান্ট টু সি,” কখন যে লর্ড হেস্টিংস সুরাপাত্র হাতে নিয়ে তাঁদের কথোপকথনের মাঝে এসে গেছেন, তা দুজনের কেউই বোঝেননি। এই সকল ব্রিটিশ অফিসাররা দ্রুত ভারতীয় ভাষাসকল শিখে নিয়েছেন। তাই কোনো আলোচনাই তাঁদের বোধের বাইরে নয়।

রাত্রি তখন গভীর। মহারাজ চৈত সিং, নন্দকুমার ছাড়াও চলেছেন লর্ড হেস্টিংস আর স্যার ইম্পে। মিসেস ইম্পে তখন নেশা করে গভীর নিদ্রামগ্ন। তাঁদের গন্তব্য মণিকর্ণিকার মহাশ্মশান, যেখানে কখনো চিতা নেভে না। কাশীরাজের বজরা মণিকর্ণকার ঘাটে লাগল। কাপালিকরা নরকরোটি নিয়ে দেবীবিগ্রহ ঘিরে নৃত্য করছেন, মুঠো মুঠো ছাই উড়ছে বাতাসে, যজ্ঞের আগুনে আহুতি হচ্ছে শবমাংসের আর রক্তের, এমন ভয়ানক দৃশ্য দেখে যে কোনো সাধারণ মানুষের হৃদয় কম্পিত হতে বাধ্য। তবে দিওয়ান নন্দকুমার বাল্যকাল হতে শাক্তমতে শক্তি আরাধনা দেখে আসছেন, তিনি পঞ্চমুণ্ডির আসন ও তান্ত্রিক সাধনাও

দেখেছেন, কিন্তু এ বড়ই ভয়ানক পূজা পদ্ধতি।

“রাজপুরোহিত নীলকন্ঠ মিশ্র বললেন দেবী আকালী এক সময়ে মগধরাজ জরাসন্ধের আরাধ্যা ছিলেন। এঁরই সামনে জরাসন্ধ একশত এক রাজাকে বলী দেওয়ার মনোস্থ করেন। আর, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের রক্ষা করার জন্য ভীমসেন আর অর্জুনকে নিয়ে মগধে পৌঁছান। এঁর পুজো যেমন সাধককে অলৌকিক সিদ্ধিও দেয়, তেমনই সাধককে দ্রুত মৃত্যুমুখে পতিত করে। সেই হেতু আমার প্রাসাদে রাজপুরোহিত এ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে নিষেধ করলেন। কালই দ্বিপ্রহরে গঙ্গাবক্ষে এই মূর্তি নিমজ্জিত করবো আমি।” মহারাজ চৈত সিং বললেন।

ধোঁয়া আর ছাইয়ের মধ্য দিয়ে দেবীর বিগ্রহ দৃষ্টিগোচর হল। মা আকালী যেন তাঁর শঙ্খের দাঁতগুলি বিকশিত করে হাসছেন। দিওয়ান নন্দকুমার এক দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করলেন।

“হোয়াট আ ওয়াণ্ডারফুল আইডল,” লর্ড হেস্টিংসও মন্ত্রমুগ্ধ। “দিস ইজ আ রেয়ার অ্যান্টিক স্পেসিমেন।” লর্ড হেস্টিংসের দৃষ্টি দেবীর নবরত্নের অলঙ্কারের প্রতি নিবদ্ধ।

“য়্যু আর রাইট,” স্যার ইম্পে বললেন, “এই মূর্তিটা লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে থাকা উচিত।”

“দিস ইজ ইমপসেবল,” মহারাজা চৈত সিং বললেন, “এই বিগ্রহ অভিশপ্ত। এর বিসর্জনই ঠিক...”

"ইণ্ডিয়ান কার্স আমাদের ব্রিটিশার্সদের স্পর্শ করতে পারবে না। দেশ-বিদেশের এমন অনেক অভিশপ্ত জিনিস নিয়ে আমাদের মিউজিয়ম সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।" লর্ড হেস্টিংস অহঙ্কারের হাসি হাসলেন, "আর আপনারা তো মূর্তিটি বিসর্জনই দিয়ে দেবেন। তাহলে গঙ্গা বা টেমসে কি আসে যায়?"

"আপনারা দেবীমার পুজোয় এসেছেন, শান্ত মনে পুজো দেখুন," শুভ্রবসনা এক নারী তাঁদের স্বাগত জানালেন।

"ইনিই রাজমাতা অহল্যাবাঈ," চৈত সিং বললেন।

সকলেই দেবীমায়ের সামনে বসে রাতভোর পুজো দেখলেন। সকালের আলো ফোটার পর পুনরায় রাজবাড়ীতে ফেরার পালা, রাজমাতাও পুনরায় ফিরে গেলেন খননকার্য্যের স্থানে, যদি এবার বাবা বিশ্বনাথ মুখ তুলে চান!

লর্ড হেস্টিংস এখনও জেদ ছাড়েননি, আকালীদেবীর মূর্তি উনি কিছুতেই বিসর্জন দিতে দেবেন না। যেকোনো মূল্যে মূর্তি যাবেই যাবে লণ্ডনে।

"আপনি যদি আমার শর্তে রাজি না হন তো আপনার রাজত্বও আর বেশীদিন নয়," লর্ড হেস্টিংস বললেন। মহারাজ চৈত সিং বিরাট ধাক্কা খেলেন। ইংরাজদের উনি এতদিন হিন্দুদের বন্ধু ভাবতেন...

দিওয়ান নন্দকুমার এবার এগিয়ে এলেন, "আমাদের দেশের ভাবাবেগটাও বুঝুন..."

"মহারাজ নন্দকুমার, ডোন্ট ফরগেট আপনি নিজের দেশের নবাব সিরাজের সাথে কি করেছেন? দেশের বিশ্বাসঘাতকের মুখে দেশের ভাবাবেগের কথা শোভা পায় না।" লর্ড হেস্টিংসের মুখে ক্রূঢ়তার হাসি।

মহারাজ নন্দকুমারের রাগ চড়ে গেল, "আপনিও সাড়ে তিন লাখ টাকা ঘুষ নিয়েছেন মীরজাফরের বিধবা মুন্নিবেগমের কাছ থেকে, যাতে তিনিই হন নবাবের হারেমের মালিকা।"

"আমার হাতে বন্দী আছেন বুলাকিলাল শেঠ, মীরকাশিমের অতুল ঐশ্বর্য্য নিয়ে সে যাচ্ছিল ব্রিটিশবিরোধী শক্তিদের কাছে। সীলমোহরটা আপনার..." লর্ড হেস্টিংস বললেন।

"সীলমোহরটা জালি," নন্দকুমার বলার চেষ্টা করলেন।

"প্রমাণ করতে পারবেন?" লর্ড হেস্টিংস হাসলেন, "মুন্নিবেগম আর বুলাকিলাল শেঠ আমার হাতে..."

মহারাজ নন্দকুমার বুঝলেন যে, তাঁর অতীতের ক্রিয়াকর্মের ফল তাঁকে হয়তো একদিন পেতেই হবে। তবে এই দেবীবিগ্রহ তিনি কিছুতেই বিদেশে যেতে দেবেন না। মহারাজ নন্দকুমার তাঁর নৌকা গোপনে প্রস্তুত করলেন। দ্বিপ্রহরে বিসর্জনের সময়ের আগেই আকালীদেবীর মূর্তি তোলা হল নৌকায়। নৌকা বারাণসী ছাড়তেই, মনে হল ইংরাজদের বজরাও পিছু নিয়েছে

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! নন্দকুমারের নৌকা যেন তীরবেগে ছুটছে। মাঝিমল্লারাও হতবাক!

"সবই মায়ের ইচ্ছে," মহারাজ নন্দকুমার কপালে হাত ঠেকালেন।

ইংরাজদের বজরা পিছনে পড়ে গেল, ক্রমশ তা ছোট হতে হতে হারিয়ে গেল। মহারাজ নন্দকুমার আশ্বস্ত হলেন, এবার একেবারে কলকাতা। ওঁর বিডন স্ট্রিটের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হবেন মা আকালী। কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন মহারাজ।

"মহারাজ, মহারাজ," ব্যকুল হয়ে ডাকছে মাঝিসর্দার। মহারাজ নন্দকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হল, "কি হয়েছে?" তিনি বুঝলেন নৌকা নড়ছে না মোটেও। "কলিকাতা কি এসে গেছে?" তা তো নয়! দুপাশে তো জঙ্গল।

"মহারাজ, নৌকা চড়ায় আটকে গেছে।" মাঝিসর্দার বললেন। কাল যে নৌকো তীরবেগে ছুটছিল আজ তা সামান্য চড়ায় আটকে গেল? মহারাজ নন্দকুমার চারপাশটা দেখলেন। তীরে শ্মশানভূমি, তবে দৃশ্যপট তাঁর অচেনা নয়! এ গ্রাম তাঁরই জন্মভূমি ভদ্রপুর। মায়ের কি ইচ্ছা! নৌকা কেমন গঙ্গাবক্ষ ছেড়ে আপনা হতেই ব্রাহ্মণী নদীতে প্রবেশ করেছে। সত্যিই তো, কলকাতায় নিয়ে গেলে কি তিনি বাঁচাতে পারতেন মায়ের এই বিগ্রহকে? তার চেয়ে এই অখ্যাত গ্রামই সুরক্ষিত। তাঁর পৈতৃকভিটায় যে ভট্টাচায্যি

মশাই পুজো করতেন তাঁর কাছেই এই মূর্তি সংরক্ষিত থাকবে। যেমন ভাবা তেমন কাজ।

মহারাজ নন্দকুমার গ্রামের মাটি ছুঁলেন। বৃদ্ধ পুজারী আজও তাঁদের ভিটের কুলদেবীর পুজো করে চলেছেন। দিওয়ান-মহারাজকে দেখে ভট্টাচায্যিমশাই তো আপ্লুত, সেই কোন ছোটবেলায় তাঁকে দেখেছিলেন, তখন তিনিও বালকই ছিলেন। তারপর সিরাজদৌল্লার দরবারে দিওয়ানি, সিরাজের পতন আর নতুন নবাবদের দরবারেও তাঁর একরকম প্রতিপত্তি এই ভদ্রপুরের মাটি থেকে ক্রমশই দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। আজ সেই দিওয়ান মহারাজ তাঁর সামনে?

মহারাজ তাঁর বাল্যবন্ধুকে মায়ের মূর্তিটা দিতেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভীষণ চমকে উঠলেন, "একমাত্র তন্ত্রমতেই দেবী আকালীর প্রতিষ্ঠা সম্ভব।" ভট্টাচার্য্যমশাই চিন্তিতভাবে বললেন, "কিন্তু মনে রাখবেন, যে ব্যক্তি ধরাতলে এই দেবী মূর্তির প্রতিস্থাপনের সংকল্প করেন, তাঁর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে অকালমৃত্যু অনির্বায। এটাই জরাসন্ধের অভিশাপ।"

"আমার কিছু হলে আমার পুত্র গুরুদাস করবে, কিন্তু সংকল্প আমার নামেই হবে। আপনি এঁর রক্ষা করুন," মহারাজ এই বলে পুনরায় নৌকায় উঠলেন। নৌকা চলতে লাগল তীরবেগে কলকাতা অভিমুখে। কলকাতার মাটি ছোঁয়ার আগেই খবর পেলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সেনারা তাঁর বিডনস্ট্রিটের বাড়ি দখল করেছে, তিনি নাকি লুকিয়ে

রেখেছেন মীরকাশিমের অতুল সম্পদ।

খবরটা শুনে মহারাজ নন্দকুমার মনে মনে হাসলেন, "সবে তো শুরু। তবে ওরা যা খুঁজছে তা কখনোই পাবে না।"

যখন কলকাতার বুকে মহারাজ নন্দকুমারের বিচার চলতে থাকলো, ঠিক তখনই তাঁর পুত্র গুরুদাস অখ্যাত ভদ্রপুরে তৈরী করতে লাগলেন দেবী আকালী বা গুহ্যকালীর মন্দির। কিন্তু নির্মানকার্য শেষ হওয়ার আগেই ফলিভূত হল জরাসন্ধের অভিশাপ।

ধরা পড়ার পর, মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী হল বিচারে, গুরুদাস কেঁদে লুটিয়ে পড়লেন দেবীর বেদীতে, আর তাই দেখে পাতালবাসিনী গুহ্যকালীরও বোধ হয় বুক ফেটে গেল, বিশাল শব্দে নবনির্মিত মন্দিরগাত্রে ফাটল ধরিয়ে দেবী জানালেন তাঁর সাধকের মৃত্যু তিনিও মেনে নেননি। ■

**তথ্যসূত্র:*

'Story of Rani Ahilyabai who rebuilt Banaras' Kashi Vishwanath, when Aurangzeb destroyed it' by Dharam Sikarwar, The Youth, 2019.

আকালিপুরের কালীপ্রতিমা, তুষার ভট্টাচার্য, সংবাদ প্রতিদিন, ২৮ অক্টোবর, ২০১০।

গুহ্যকালীর ধ্যান, স্তবকবচমালা ও ধ্যানমালা, পণ্ডিত বামদেব ভট্টাচার্য সম্পাদিত, অক্ষয় লাইব্রেরি, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৮৮।

ইন্টারনেট লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে এই ঐতিহাসিক কল্পকাহিনীটি রচিত হয়েছে।

এক জনমের ভালোবাসা

দালান জাহান (সেন্ট্রাল আফ্রিকা)

আমার সর্বস্ব দিয়ে যে নাম লিখেছিলাম
আজ তার কোন অর্থ হয় না
কিন্তু সে নাম উচ্চারণ করলেই
বাতাস শীতল হয়ে যায়
হৃদয়ের সবটুকু ব্যকুলতা
মহাসমুদ্রের কোলাহল নিয়ে নিশ্চুপ হয়ে যায়।

পৃথিবীর সব জল
সবটুকু রঙ তোমার আলপনায় ঢেলে
অবশেষে ফিরে আসি আকাশের তলে
তুমি ক্লান্তির মতো বেড়ে উঠা মেদ
ভেঙে পড়া মেঘের মতো
আমার শুধু নিস্ফল ক্রন্দন...

প্রতিদিন ভুল করে খোলা রাখি দুয়ার
মিথ্যে করে হলেও এসে বলে যেও
এক জনমে ভালোবাসার হয় না মরন। ■

বিশেষ ঘোষণা

গুঞ্জনে প্রতি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্তই পরের (মাসের) সংখ্যার জন্য লেখা গ্রহণ করা হয়।

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২০

http://online.fliphtml5.com/osgiu/kjbd/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/hljw/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/lmjq/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/dadg/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lgaq/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tefw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eitj/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/vsgw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lpsr/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/xnih/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/buzn/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/mjwo/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **‘গুঞ্জন’এর ২০২০ তে প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।**

নূর

২য় পর্ব

পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস

এখন দীপু খুবই গম্ভীর থাকে। জুনিয়র এবং সহপাঠীরা তাকে খুবই সমীহ করে চলে। প্রফেসরদেরও দীপুর ওপর অগাধ আস্থা। কেউই বিনা প্রয়োজনে তাকে ঘাঁটায় না। আজ নূর ইউনিভার্সিটি আসেনি। দীপুর চোখ তাকে খুঁজেছে, কিন্তু কাউকে মুখ ফুটে সে নূরের কথা জিজ্ঞাসা করেনি। ক্লাসের শেষে বাড়ি ফিরে সে বইয়ে মুখ গুঁজে বসে আছে। মা লক্ষ্য করেছেন কিন্তু ছেলের পরীক্ষা সামনে ভেবে তাকে আর বিরক্ত করেননি। পরের দিনও দীপু ইউনিভার্সিটি গিয়ে আর নূরের দেখা পায়নি। মনকে শক্ত করে বাড়ি ফিরে আঁকড়ে ধরেছে বইকে। বাড়ির সবার সাথে কথা এক রকম বন্ধ। মা সকাল বিকাল ঠিক ঠিক সময়ে খাবার দিয়ে খেতে ডাকেন, কখনও সে খেতে আসে কখনও আসে না, মা খাবার ঢেকে রেখে রাখেন। যত পরীক্ষার দিন এগিয়ে আসে দীপঙ্করের চেহারাও কঙ্কালসার হতে থাকে। সেদিন দুপুরের খাবার দিতে গিয়ে, মা দীপুকে কিছু একটা বলতে গিয়েও বলতে পারেন না, গলা বুঁজে আসে। সন্ধ্যায় তার টেবিলে রাখা বইয়ের মধ্যে একটা খাম

রেখে আসেন। দীপুর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় সে খাম।

আজ পরীক্ষা শেষ করে বহুদিন পরে সে পদ্মার চড়ে একা অনেকটা সময় কাটাল। মনটা খুব খারাপ। সে নূরের বিয়েতে উপস্থিত থাকতে পারেনি। আর থাকতোই বা কি করে? নূরের যখন বিয়ে হচ্ছে তখন সে শেষ পেপারের পরীক্ষা দিচ্ছে। পরীক্ষা শেষে যখন ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয়েছে, ততক্ষনে নূর তার শ্বশুরালয়ের পথে পাড়ি দিয়েছে। নূর ছাড়া কোনদিনই একা এই চড়ে সে আসতো না। এখন যেন কেরিয়ার নামক ভূত তার ওপর ভর করেছে। কালই রওনা হতে হবে ঢাকায়। বেশ কিছু ইন্টারভিউ আছে। বাড়ি ফিরে গোছগাছ করতে গিয়ে একটা খাম দেখতে পায়, মার রেখে যাওয়া সেই পুরনো খাম, নূরের বিয়ের আমন্ত্রণ পত্র। মনের কোনায় এক এক করে ভিড় করতে থাকে ফেলে আসা দিনের স্মৃতিরা। মনে পড়ে যায় নূরের সাথে দেখা শেষের সেই দিনটা। গলাটা কেমন যেন শুকিয়ে আসে, দীপু আসতে আসতে নামিয়ে রাখে খামটা।

মাস তিনেক পরে ঢাকা থেকে ফিরে এসেছে দীপু। এক মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে মোটা টাকার চাকরির অফার পেয়েছে। আজ ইউনিভার্সিটিতে শেষ বারের মতো যাচ্ছে সে, রেজাল্ট বেড়িয়েছে। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে। প্রফেসর আর বন্ধুদের সাথে দেখা করে ফেরার পথে যাবো কি যাবো না করতে করতে নূরদের বাড়ির দিকে সে পা বাড়ায়। মনে

মনে অভিমানও করে, নূর কি বিয়ের পর তার সাথে একটিবার দেখা করার কথাও ভাবতে পারল না! বড় অফিসারের সাথে বিয়ে হয়ে, সে সব ভুলে গেল!

এতদিন পরে দীপুকে দেখে এবং তার রেজাল্ট শুনে নূরের মা বাবা আনন্দে আত্মহারা। আদর আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হল না কিন্তু দীপু আজ কিছুই যেন মুখে তুলতে পারলো না, অজুহাত দিয়ে খাবার সরিয়ে রাখল। এই প্রথম দীপু মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে পারল না নূরের কথা। যতবার বলতে গেছে মনে হয়েছে কে যেন জোর করে তার গলা টিপে ধরেছে। নূরদের বাড়ি থেকে বের হবার সময় নূরের মা বললেন, একটু দাঁড়াও বাবা। ঘর থেকে একটা খাম এনে দীপুর হাতে দিয়ে বললেন, এটা নূর তোমার হাতে দিতে বলে গেছে, তুমি ছিলে না তাই দিতে পারিনি। দীপু দেখল বন্ধ খামের ওপর নূরের হাতে লেখা, "দীপু তোমাকে।" এক কাষ্ঠ হাসি দিয়ে বিদায় নিল সে।

খামটা নিয়ে পদ্মার চড়ে এসে বসেছে। নূর তো এত বছরে কোনদিনই তাকে দীপু বলে ডাকেনি। তুই-তোকারি করেছে, ডাকতে হলে বলেছে, 'এই শোন না।' আজ খামের ওপর 'দীপু'! আস্তে আস্তে খামটা খোলে সে, একটা কবিতার ছেঁড়া পাতা।

"তোমায় আমি দেখি নাকো, শুধু তোমার স্বপ্ন দেখি,
তুমি আমায় বারে বারে শুধাও, ওগো সত্য সে কি?

কি জানি গো, হয়তো বুঝি
তোমার মাঝে কেবল খুঁজি
এই জনমের রূপের তলে আর - জনমের ভাবের স্মৃতি।”

বুঝতে পারে না সে কি ভুল করেছে। তবে কি নূর তাকে ভালোবাসতো? নূর কি তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল? হিন্দু মুসলমান দুই পরিবারের মধ্যে বিয়ে, দুই পরিবার কি মেনে নিত? নূর কেন সোজাসুজি তাকে জানালো না যে সে তাকে ভালোবাসে, বিয়ে করতে চায়? কোনো প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় না দীপু। ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে তার মনটা। ...ক্রমশ■

প্রজন্ম

রিয়া মিত্র

যুগের পর যুগ কেটে যায়
নতুন যুগ আসে,
সময় তো পরিবর্তনশীল
ক্ষণিকের নিঃশ্বাসে।
আগামী যুগ কাটাবে একদিন
মানুষের প্রজন্ম,
সাথে থাকবে পূর্বপুরুষের
আশিসের বর্ম।
একের পর এক প্রজন্ম আসবে
যুগের নিয়ম এটাই,
শিকড় কিন্তু একই থাকবে
যতই সময় কাটাই। ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২১

https://online.fliphtml5.com/osgiu/wlch

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ymfp

https://online.fliphtml5.com/osgiu/kabb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/inhj

https://online.fliphtml5.com/osgiu/nmnj

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ckkh

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tlro

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ehsn

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ogbi

https://online.fliphtml5.com/osgiu/zrsw

https://online.fliphtml5.com/osgiu/iirn

https://online.fliphtml5.com/osgiu/uuyz

পাঠকদের সুবিধার্থে

নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা 'গুঞ্জন'-এর ২০২১ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।

এখনো ইচ্ছে করে

সুধীর বরণ মাঝি

আমার এখনো ইচ্ছে করে
আঠারো বছরের যুবকের মতো
রাজপথ কাঁপিয়ে মিছিল করি।
মেহনতী মানুষের মুক্তির অধিকার নিয়ে
দৃঢ় চিত্তে সাহসে ভর করে এগিয়ে চলি।
আমার এখনো ইচ্ছে করে
আঠারো বছরের যুবকের মতো
ভেঙ্গেচুরে পাড়ি দেই দুর্বার শৃঙ্খল।
গড়ি প্রতিরোধ গড়ি সমতার স্বপ্ন
আগলে রাখি দেশপ্রেম মানবপ্রেম।
আমার এখনো ইচ্ছে করে
আঠারো বছরের যুবকের মতো
বাঁধনহারা জীবনের গান গেয়ে ঘুরে বেড়াই।
অসহায় প্রতিবেশীর সহায় হতে
সৃষ্টির উল্লাসে কূপমন্ডুকতা দূর করি।
আমার এখনো ইচ্ছে করে
আঠারো বছরের যুবকের মতো
সমাজ ভাবনার স্বপ্ন দেখি।

ঐচ্ছিক

সৃষ্টিশীল প্রেমে জড়াই নিজেকে
মরণের ভয় যেখানে হয় তুচ্ছ।
আমার এখনো ইচ্ছে করে
আঠারো বছরের যুবকের মতো
সকল জীর্ণতা দীনতা কুসংস্কার ভাঙি।
বিজ্ঞানের আলোয় নিজেকে জানি
ভেঙে করি চুরমার আছে যতো মিথ্যে কারবার।
আমার এখনো ইচ্ছে করে
আঠারো বছরের যুবকের মতো
উদীয়মান সূর্যের আর সিডরের গতিতে ছুটে চলি।
কোন বারণ না মেনে
ন্যায়ের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি।
আমার এখনো ইচ্ছে করে
আঠারো বছরের যুবকের মতো
উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দেই।
ভালোবাসার অমৃত সুধা পান করে
বিশ্ব জয়ে ছুটে চলি। ■

প্ল্যাটফর্ম

(প্রথম পর্ব)

দেবী প্রসাদ চৌধুরী

ডাউন ‘কামরূপ এক্সপ্রেস’ আধ ঘন্টা লেট। সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। স্টেশনে ‘রড লাইট’-এর আলোয় যাত্রীরা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ কেউ মোট-গাঁট নিয়ে বসে আছে। আমিও চাইলাম প্ল্যাটফর্ম-এর বেঞ্চিতে বসতে। কোথাও একটি সিটও খালি নেই।

প্ল্যাটফর্ম-এর মাঝামাঝি বেঞ্চিতে দেখলাম কয়েকজন সরে বসলে একটি সিট হয়, তাই বারবার এদিক দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বেঞ্চিতে মধ্যবয়স্ক দু’জন ভদ্রলোকের সঙ্গে দু’জন মহিলা বসেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন, ওঁর স্থির দৃষ্টি দিয়ে আমাকে খুব লক্ষ্য করছেন। অনেকক্ষণ থেকে দেখছি ওঁর টলটলে চোখ দু’টি প্ল্যাটফর্মের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কোথায় যেন দেখেছি ওঁকে, এই মুহূর্তে ঠিক মনে পড়ছে না।

আমার চলাফেরার গতির দিকে ওঁকে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে আমি মনে মনে একটা কৌতূহল বোধ করলাম, তাই কাছে এগিয়ে গেলাম ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে দু’একজন পরিচিত মুখের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। কেউ যাত্রী, কেউ অন্য কাউকে উঠিয়ে দিতে এসেছে। আমি ওদের বেঞ্চিটার কাছে

দাঁড়িয়ে রইলাম। পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, মেয়েটি তাকিয়েই রয়েছে। চোখাচোখি হতেই ও মিষ্টি করে হাসল। আর কিছু ভাবার আগেই আমাকে একরকম অবাক করে দিয়ে বলল, 'কোথাও যাচ্ছেন বুঝি?' আমি বোকার মত মাথা নাড়িয়ে বললাম, 'না।'

'আপনি আনন্দশঙ্কর না?' ওর পাল্টা প্রশ্নে সম্মতি জানালাম। ও বুঝল ওকে আমি চিনতে চেষ্টা করছি। ও আবার বলল, 'আমাকে চিনতে পারলেন?'

'না তো।' ও হাসল। ওকে দেখতে আরও ভালো লাগল।

'আমি সুপর্ণা।'

আমার কিছুতেই মনে পড়ছে না। এ নামে আমার চেনা-জানা সমস্ত মেয়েদের ছবি একঝলক মনে পড়ল। আত্মীয়-স্বজন হয় কি না, মনে করতে পারলাম না, যদিও অনেক চেষ্টা চালালাম। দেখলাম বেঞ্চি থেকে একটু সরে একটা সিট খালি করে দিল ও। তারপরই বলল, 'এখানে বসুন, বলছি...' আমি বসলাম ওর পাশে সামান্য ব্যবধান রেখে। ওর চোখ দু'টি খুশিতে চকচক করছে। পাশের দু'জন মানুষকে দেখিয়ে, ও বলল, 'আমার মামা-মামী। কলকাতায় থাকেন। আমি কিছু জানার আগেই নমস্কার বিনিময়টা সেরে নিলাম। তারপর সুপর্ণা বলল, 'মনে আছে? একবার কলকাতা থেকে আসার সময় জেলে ডিঙি করে আমরা একসাথে গিয়েছিলাম, আমি আর আমার একটি ছোট ভাই। আপনি সেদিন না থাকলে কি দুর্ভোগ হত বলুন তো?'

এবার একটু একটু মনে আসছে। সেদিনের সেই মেয়েটি আজ আমার চোখের সামনে, অথচ মনেই আসছিল না এতক্ষণ। নামটা মনে না থাকলেও, ঘটনাটি মনে আছে আমার। ফারাক্কা ব্যারেজের কাজ তখন সবে মাত্র শুরু হয়েছে। সেই সময়ে কলকাতার সঙ্গে উত্তর বাংলার যোগাযোগ খুব খারাপ ছিল। তাই বললাম, 'এত দিনের কথা মনে রাখলেও, আপনাকে চেনা একটু কষ্টকর বৈকি। তা ছাড়া আমার স্মৃতিশক্তিও কম।'

– 'সত্যিই কম, তা নইলে আমি চিনলাম কি করে?' একটু থেমে সুপর্ণা বলল, 'কেউ যাবেন, না আসবেন?' আমি বললাম, 'আসাম থেকে আমার এক কাকা আসছেন।' আমার দিকে ভালো করে দেখে নিলো সুপর্ণা, তারপর বলল, 'আগের থেকে অনেক শুকিয়ে গেছেন। চিনতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু আপনার মাথার চুলটা যে অদ্বিতীয়। ওটা দেখেই সাহস পেয়েছি।'

– 'এত কষ্ট করে চেনার কী প্রয়োজন ছিল?'

– আমার কথায় একটু আহত হল বুঝলাম। তবুও সে আস্তে করে বলল, 'জানেন মন থেকে কিছু গভীরভাবে চাইলে, একদিন না একদিন তা লাভ করা যায়।'

এরপর অনেক কথা হল। আমি কি করছি, সে কী করছে... এতদিন কিভাবে কোথায় রেলের চাকরিতে ওর বাবার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে। আবার এখানে কিভাবে বদলি হয়েছে – একে একে সব বলতে লাগলো ও। আমার মন ওর কথার মধ্যে নেই। মন চলে গেছে ১৯৬৬ সনের গোড়ায়।

প্রবাহ

তখন আমি কলেজের ছাত্র। সুপর্ণা হায়ার সেকেন্ডারি দেবে, ট্রেনে জেনেছিলাম। সেবার কলকাতা থেকে ফেরার সময় ট্রেনে সুপর্ণাও ছিল আমাদের কামরার একজন মহিলা যাত্রী। ট্রেনের অন্য সব যাত্রীদের সঙ্গে যেমন আলাপ হয়ে থাকে, তেমনি করে ওর সঙ্গেও আমার কথা হয়েছিল। আমিও নিউ আলিপুর দুয়ারে আসব জেনে, সে ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। কারণ সেবার ওর সঙ্গে একমাত্র ছোট্ট একটি দশ-এগারো বছরের ভাই ছিল। আমাদের কারুরই রিজার্ভেশন ছিল না। ভাবনায় ছিলাম ফারাক্কায় এসে দার্জিলিং মেলে পাব কিনা! রাত ন'টায় ট্রেন ছাড়তো 'খেজুরিয়া' ঘাট থেকে। পরপর দু'টি ট্রেনের যাত্রী দার্জিলিং মেলে ভীড় করবে, আবার পরের দিন সকালে নিউ জলপাইগুড়িতে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে চড়তে হবে।

যথারীতি ট্রেন ফারাক্কা স্টেশনে থামল। এখান থেকে ঘন্টা চারেক এর জন্য কেউ কারুর নয়। কার আগে কে এগিয়ে ওপারে ট্রেনে জায়গা নেবে তারই চিন্তা। যাত্রীরা মোটগাঁট নিয়ে কেউ স্টীমার কেউ লঞ্চের জন্য ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। স্বার্থপরের মত আমিও আমার এয়ার ব্যাগটি নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে ঘাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। মেয়েটি তার ভাইকে নিয়ে আমার পিছনে একরকম দৌড়চ্ছে। ওর হাতে বেশ বড় একখানা স্যুটকেস, কাঁধে ভ্যানিটি ব্যাগ। ছেলেটির হাতে ছোট্ট একটি এয়ার ব্যাগ। ওরা হাঁপিয়ে উঠেছে একরকম। তখন আমার পেছনে একটা মেয়ের কণ্ঠ শুনলাম, 'একটু আস্তে হাঁটুন না।'

... ক্রমশ ■

ভাবো কি তাদের কথা?

শুভা লাহিড়ী

নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত তো থাকো
ভাবো কি তাদের কথা!
খেয়ে থাকে কি, না খেয়ে থাকে!
বোঝ কি তাদের ব্যাথা!
সকলের তরে অন্ন জোগাতে,
অন্ন জোটে না পেটে,
সকাল থেকে সারাদিন তারা
মরে শুধু খেটে খেটে।
তারাও রাতেতে স্বপ্ন দেখে,
কেমন ফলবে ধান!
হলে ধান ভালো, মিটবে যে কালো
বাঁচবে সবার প্রাণ।

তোমরা হয়তো বলবে আমায়,
"কি সব লিখছো বাজে!
ধনীদের ছেড়ে গরীবের গুন
গাওয়া কি কারোরই সাজে!
এর চেয়ে করো ধনীদের স্তব,

উপহার তুমি পাবে,
তা না করে তুমি ভেবেই চলেছো
তারাও কেমনে খাবে!”

ক্ষিদে তো বোঝে না ধনী ও গরীব
তাইতো ক্ষিদেটা পায়।
খুব ক্ষিদে পেলে, জমির ধারেই
ঘটি ঘটি জল খায়...
তোমরা বলবে বানিয়ে বলছি,
এমন হয় না কিছু!
আমরা শুধুই মূর্তিটা দেখি
দেখি না তো তার পিছু...

মূর্তি যখন বানায় কুমোর
দেখেছো কি মন দিয়ে?
সামনেটা শুধু কারুকাজে ভরা
পেছনে তো বাঁশ দিয়ে...
এমনি ভাবেই পৃথিবীকে মোরা,
দেখি যে রঙিন চশমায়...
চোখে তো পরে না ক্ষিদের পেটে,
করে যারা শুধু হায় হায়...
যদি কেউ তারা তাদের কষ্ট,
বলে গো মোদের এসে!

চিন্তন

বিবেকেতে খিল দিয়ে দিই মোরা,
যাই না আবেগে ভেসে।
মন, প্রাণ আর বিবেক মোদের,
চলে গেছে বুঝি ছেড়ে!
তাইতো সকলে হন্যে হয়ে,
স্বার্থটা খুঁজে ফেরে।

সারাদিনে শুধু একবার যদি
ভাবো গো তাদের নিয়ে!
পাষাণ এ হৃদয় গলে গিয়ে দেখো
খোঁজ নেবে সেথা গিয়ে।
তারাও তখন খুশি হয়ে মনে
নিষ্পাপ হাসি হেসে,
চোখের কোণের লোনা জল সাথে
আবেগে যাবে গো ভেসে... ■
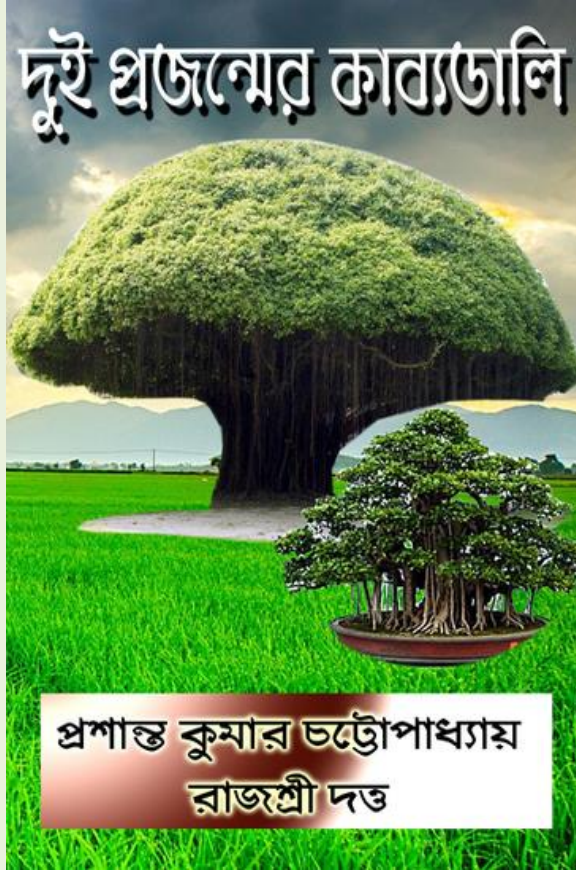
দুই প্রজন্মের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে, বর্তমানের কিছু চিত্র শুধু ভাষার মাধ্যমে একত্রে উপস্থাপন করেছেন দুই প্রজন্মের দুই কবি। আধুনিক কবিতা প্রেমীদের জন্য একটি অসামান্য কবিতা সংগ্রহ।

প্রাপ্তিস্থলঃ 1) www.flipkart.com

(Search Words: dui-projonmer-kabyadali)

2) E-mail: contactpandulipi@gmail.com

আমার ছোটবেলার শীত

শান্তিপদ চক্রবর্ত্তী

শীতকালটা প্রত্যেকটা মানুষের কাছে ভীষণ একটা ভালো কাল বলা যেতে পারে, অন্তত রসে-বসে বাঙালী ও ভোজন রসিকদের কাছে তো বটেই। ঠিক বললাম কি?

না, ঠিক বললাম না। যারা হত-দরিদ্র, ফুটপাতে খোলা আকাশের নীচে যাদের রাত্রিবাস, যাদের কোন শীতবস্ত্র নেই, কুঁকড়ে রাত্রিরে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে, তাদের কাছে এই শীতকাল একটা ভয়ঙ্কর কাল। দারুণ ঠান্ডায় অনেকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এছাড়া বয়স্ক মানুষদের কাছে শীতকাল মোটেই আশা ব্যঞ্জক নয়, তারা শীতকালীন অসুখ-বিসুখে ভুগে জর্জরিত হয়ে যায়। তবে আমার কাছে শীতকালের একটা মাধুর্য্য আছে। শীতকালের অনেক মধুর স্মৃতি আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে।

ডিসেম্বর মাসের পৌষের সকাল, কনকনে হাড় হিম করা ঠান্ডা। তা ধরুন বহু বছর আগেকার কথা। কতই বা বয়স হবে আমার, বড়জোর দশ-বারো হবে। ছোটবেলার অনেক স্মৃতি এখনও স্পষ্ট মনে আছে। হৃদয়ের মনি-কোঠায় স্মৃতিগুলি সযত্নে লালন করে রেখেছি। বড় মিস করি

স্মৃতিপট

ছোটোবেলাকে, কত বৈচিত্র্যময় জীবন ছিল তখন। স্নানের সময় হয়ে এসেছে, আতঙ্কিত হয়ে পড়ছি ঠান্ডা জলে স্নান করতে হবে বলে। তখন গ্যাস ছিল না, কয়লার উনুনে রান্না চলত। তাই গরম জলে স্নান করার কথা ভাবা দুরাশা মাত্র। গায়ে জবজবে সর্ষের তেল মেখে জলভর্তি মগ নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে প্রতীক্ষা করতাম আর মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতাম। তারপর ঝপাং করে মাথায় জল ঢেলে দিতাম। তারপর নিমেষের মধ্যে বালতির জল কয়েক মিনিটের মধ্যে নিঃশেষিত করে গামছা দিয়ে গা-হাত-পা মুছে জামা-প্যান্ট পড়ে নিতাম। স্নান করার পরে তখন যে কি ক্ষিদে পেতো তা বলার নয়, কিন্তু কই এখন তো আর তেমন ক্ষিদে পায় না!

মা গরম ভাত-ডাল, কিছু একটা সব্জি আর মাছ দিয়ে খেতে দিতেন। পরম তৃপ্তির সঙ্গে গপগপ করে চেটেপুটে খেয়ে নিতাম। মায়ের হাতের রান্নাতে যেন জাদু ছিল।

মা সস্নেহে বলতেন, ‘আর দুটি ভাত দিই বাবা?’

‘দাও, তবে ডাল আর সব্জিটা একটু দিও’ হাত চাটতে চাটতে বলতাম।

‘বাবা, তুই না বললেও দিতাম, ভাত ক'টা কি দিয়ে খাবি?’ মা বলে উঠতেন।

খাওয়া শেষ করে অপেক্ষা করতাম কখন ছাদে যাবো। কারণ ঐ দু’তিন ঘন্টা ছাদে আমার জীবনের অনেক অনেক

স্মৃতিপট

স্মৃতি, অভিজ্ঞতা, ভালোলাগার মুহূর্ত আমার জীবনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে, আর সেই স্মৃতির রোমন্থন করতে করতে আমি ছোটবেলায় হারিয়ে যাই।

গায়ে একটা হ্যান্ডলুমের চাদর পড়ে ছাদে উঠে পড়তাম, সেই চাদর এখনকার ছেলে-মেয়েরা কিছুতেই আর গায়ে দেবে না। রাস্তার ধারে একতলা বাড়ী, চারিদিক খোলা। প্রায় পনেরোশো স্কোয়ার ফুটের ছাদ। ছাদের পাঁচিলের গায়ে এসে দাঁড়াতাম। মিঠে রোদ গায়ে লাগতেই মনপ্রাণ চাঙ্গা আর শরীর গরম হয়ে উঠত। নীচে রাস্তা, বাঁদিক ও ডানদিকের চৌমাথা সহ রাস্তার অনেক অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যেত। বাড়ীর উল্টোদিকে রাস্তার ওপারে একটি টোপা কুলের গাছ ডালপালাসমেত ছাদের উপর নুয়ে পড়েছে। অনেকে তাই আমাদের বাড়ীর সামনেটা কুলতলা বলতো।

ছাদে উঠে আগে কুলগাছটার ডালপালার মধ্যে খুঁজে বেড়াতাম কোথায় কুল পেকেছে, অন্ততঃ আধপাকা হয়েছে কিনা! ডালধরে টানাটানি, টেনে-হিঁচড়ে, দুলিয়ে দু-একটা কুল ছাদ থেকেই পেড়ে নিতাম, বাকিটা আঁকশির খোঁচা মেরে নীচে রাস্তায় ফেলে দিতাম। ছুটে গিয়ে নীচ থেকে কুলগুলো কুড়িয়ে নিয়ে এসে, ধুয়ে একটু নুন নিয়ে ছাদে এসে আয়েশ করে খেতাম। কিংবা মায়ের দেওয়া একটা কমলালেবুর খোসা ছাড়িয়ে আস্তে আস্তে করে কোয়া বার করে তার মিষ্টি রসের স্বাদ গ্রহণ করতে করতে মায়ের

ভালোবাসার স্বাদ গ্রহণ করতাম। আজকে কমলালেবু আছে, কিন্তু মা নেই, তাই কমলালেবুর আর স্বাদ পাই না।

নীচের রাস্তা দিয়ে অগুন্তি লোক ও ফেরিওয়ালা চলাচল করছে। উল্টোদিকে দশ-বারোটা টালির চালের ঘরে কিছু খেটে খাওয়া পরিবার বাস করত। তারই মধ্যে এক ছোট গৃহস্থের গোশালা সমেত একটি খড়ের চালের বাড়ী। হাবির মা গোবর পা দিয়ে মাখামাখি করে নিখুঁত নিশানায় সাতকড়িবাবুর বাড়ীর পাঁচিলে ঘুটে সাঁটিয়ে দিচ্ছে শুধু একটা চটাস চটাস করে শব্দ আর বাতাসে ভেসে আসা গোবরের গন্ধ নাকে ঢুকছে। কই সেই গোবরের গন্ধ তো খারাপ লাগেনি সেদিন, কিন্তু এখন তো আর গোবরের গন্ধ সহ্য করতে পারি না। পাশে দাঁড়ানো গাভীটা শুকনো খড় চিবিয়ে জাবর কাটছে, আর মাঝে মধ্যে হাম্বা হাম্বা করে ডাক ছাড়ছে। ওদেরই পাঁচিলে অযত্নে অবহেলায় নুইয়ে পড়া একটা ডুমুর গাছ থেকে এক ভদ্রলোক ছোট ছোট কচি ডুমুর ফল তুলে নিয়ে যাচ্ছেন। শুনেছি ডুমুরের ঝোল পেটের পক্ষে নাকি ভালো।

হঠাৎ করে কাঁসর ঘন্টার আওয়াজ, দেখি ধুতি পড়া একটি বেঁটে লোক কাঁসর ঘন্টা বাজাচ্ছে আর পিছনে ঝাঁকামুটের মাথাতে কাঁসা-পিতলের ভর্তি বাসন। তখনকার দিনে কাঁসা-পিতল বাসনের ব্যবহার ছিল খুব বেশী। সারা রাস্তা সে কাঁসর বাজিয়ে বলে বেড়াচ্ছে ‘বাসন নেবে গো,

বাসন নেবে গো।' দু-একটা বাড়ী থেকে ডাক পড়তো, কিছু বাসন তার বিক্রি হতো, তখন এক অদ্ভুত ধরণের তৃপ্তির হাসি তার চোখে-মুখে ফুটে উঠত। কিন্তু এখন আর সেই বাসনওয়ালাও নেই, তাই সুখের হাসিও আর দেখতে পাই না। কিছু ছেলে লোহার চাকতি লোহার হ্যান্ডেল দিয়ে রাস্তা দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমিও চালাতাম, কামারশালা থেকে বানিয়ে নিয়ে আসতাম। কিছুক্ষণ পরে একগুচ্ছ ছেলে কুলতলার নীচে চৌকাকৃতি গর্ত করা জায়গায় গুলি নিয়ে খেলতে লাগল। খানিকক্ষণ খেলার পর বসচা শুরু হতে রণে ভঙ্গ দিয়ে সব পালিয়ে গেল। আমিও গুলি খেলতাম, কিন্তু বিশ্বাস করুন কোনদিন জিততে পারিনি।

ইতিমধ্যে মাথায় করে মুম্বাই কুল, কমলালেবু, জয়নগরের মোয়া, পাটালি গুড়, শোনপাপড়িওয়ালারা চিৎকার করে রাস্তা দিয়ে চলে যেত। কেউ না কেউ কিনতই, আমরাও কিনতাম। টিনের বাক্সের মধ্যে পাঁচ পয়সা দামের সেই শোনপাপড়ির স্বাদ আমি এখন আর পাই না, এমনকি হলদিরাম, ভিখারামের দোকানের দামী শোনপাপড়িতেও না। কিংবা ধরুন সেই আলুরদম ঘুগনিওয়ালা, যে ঠিক তিনটের সময় মুখটা বাংলার পাঁচের মত বাকিয়ে 'ঘুগনি আলুরদম' বলে চেঁচিয়ে উঠত। চার-পাঁচটা বাড়ী থেকে নিশ্চিতভাবে তার ডাক পড়ত। একটা টিনের চৌকাকার বাক্সের মধ্যে গোল গোল বড় কৌটার মধ্যে ঘুগনি আলুরদম থাকত। একটা

শালপাতার ছোট থালাতে দু'তিনটে একদম ছোট সাইজের আলু দিয়ে বানানো আলুরদম ও টাইট ঘুগনি দিয়ে আলুগুলো কেটে মিশিয়ে দিয়ে কৌটা থেকে একটা মশলা দিয়ে পরিবেশন করত। আমি এখনও পর্যন্ত ঐ রকম সুস্বাদু ঘুগনি আলুরদম খাইনি, সে কি অপূর্ব স্বাদ! কই সে ঘুগনিওয়ালা তো আর নেই। তাই ঘুগনি আলুরদমে কোন স্বাদ পাই না সে স্টাফ আলুরদম হোক বা স্পেশাল কাবুলি ছোলার ঘুগনি হোক।

মনে হয় শৈশবের স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ সারাজীবনের মত আমি হারিয়ে ফেলেছি। তারপর একজন সেই হাওয়াই মিঠে কিংবা একটা মোটা লাঠির সঙ্গে জড়িয়ে বেনিয়া সহকলা রঙ যুক্ত একটি চকচকে বাঁশের সঙ্গে গোলাকৃতি করে জড়ানো প্লাস্টিকের মত দেখতে এক অদ্ভূত ধরনের চকলেটের স্বাদ যুক্ত মিষ্টি বিক্রি করত। দাম পাঁচ থেকে দশ পয়সা। আপনি যা চাইবেন তাই বানিয়ে দেবে — ফুল, গলার হার, কানের দুল, হাতের বালা, নৌকা অদ্ভূত ভাবে বানিয়ে দিত। আমরা খেতাম, এখন আর তাকে একদম দেখতে পাই না। ছাদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জানাশোনা কত লোকের সঙ্গে কথা বলতাম।

তারপর তিনটে যখন বেজে যেত, যখন ছেলেপুলেরা ব্যাট-বল কিংবা ফুটবল-টেনিস বল নিয়ে খেলতে বেড়িয়ে পড়তো তখন আমার মনটা মাঠে যাবার জন্য আনচান

করে উঠত, তখন আমিও রেডি হয়ে সস্তার একটা চটি পড়ে পাড়ার মাঠে কিংবা ডুমুরজলার মাঠে খেলতে বেড়িয়ে পড়তাম। হয় টেনিস বল বা ক্রিকেট খেলতাম। একদম খালি পায়ে ভালো গোলকীপার ছিলাম, মাঝেমধ্যে ফরোয়ার্ডেও খেলতাম। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করতাম। ঘন্টাখানেক খেলার পরে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্পগুজব করতাম। আজকালকার ছেলেমেয়েদের মত ফেসবুক হোয়াটস্যাপ তো ছিল না, তবে আলোচনার পরিধি অত্যন্ত সাধারণ ও অজানাকে জানার আগ্রহ ছিল অনেক বেশী। ঐ বয়সে অপোজিট সেক্স নিয়ে কিছু চিন্তাই করতে পারতাম না বা মনের মধ্যে সেই আবেগ অনুভূতি ছিল না – যেটা আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রি-ম্যাচুরিটি হয়ে দেখা যায়। মেয়েদের জাস্ট বন্ধুর থেকে বেশী কিছু ভাবতেই পারতাম না। যাইহোক একটু গল্পগুজব করে গাছে উঠে পেয়ারা, জামরুল, তেঁতুল, কুল চুরি করে খেতাম। ...ক্রমশ ■

লেখকদের কাছে বিশেষ অনুরোধ

‘গুঞ্জন’ একটি আন্তর্জাতিক নিঃশুল্ক সাহিত্য পত্রিকা, যার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল নতুন লেখকদের পাঠকদের কাছে তুলে ধরা। তাই আমাদের দপ্তরে লেখা পাঠাবার আগে নিজেই কয়েকবার ‘এডিটিং’ করে ভুল বানান বা যতি চিহ্নের প্রয়োগগুলি শুধরে নেবেন।

বর্ষবরণ

সামিমা খাতুন

আশার কিরণে,
অসীম যতনে,
সাজানো নতুন ভোর,
নবীন স্বপনে,
ভরানো জীবনে,
কাটুক ভয়ের ঘোর।

আনন্দ উজানে,
দুখের ভাসানে,
হৃদয় বাঁধন হারা,
কাঠির জিয়নে,
মনের উড়ানে,
আকাশ ছোঁয়া তারা।

পুরানোর অবসানে,
আগামীর আবাহনে,
মুখরিত এই কাল,
অপেক্ষা আনমনে,
প্রহরের ব্যবধানে,
আনন্দিত নয়া সাল। ■

https://www.facebook.com/groups/1833647555538153

ভাবনাতীত

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

জীবন বড়ই বিচিত্র। সে এক এক সময়ে এক এক রকমের অভিজ্ঞতা দেয় আমাদের, যা কখনও ভালো, কখনও বা মন্দ। দেখতে দেখতে প্রায় ছ'টা মাস কেটে গেছে, কিন্তু এখনও কোন আশানুরূপ খবর পেলাম না। ভেবেছিলাম দু'এক মাসের মধ্যেই সুখবরটা সর্ব সম্মুখে উদ্ঘাটিত করতে পারব। কিন্তু কোথায় কি! নানান সমস্যা এসে সব আশাকে প্রায় আহুতি দেবে বলে তৎপর হয়েছে। তবে এ আশা ভঙ্গের অংশীদার শুধু আমি একা নই, আমার সাথে আরও দু'জন একই ভাবে ব্যথিত। আমরা তিনজনই ভেবেই নিয়ে ছিলাম এই গত ছয় মাসে যখন কিছু হল না, আর হবে না। কিন্তু বাস্তবে, আমরা ভাবি এক হয় আরেক। হঠাৎ করে একদিন রাতে প্রশান্তবাবু ফোন করে বললেন — হ্যালো নীলাশা মেলটা চেক করেছ?

আমি কিছুটা অবাক হয়ে বোকার মতো প্রশ্ন করলাম — কেন কি আছে মেলে? নতুন কোন খবর তো আসবে না। না, নানান কাজে আর চেক করা হয়নি।

— চেক করে দেখো আগে।

চাঁদের হাট

আমি কথামতো মেল চেক করে আনন্দে উচ্ছ্বাসিত হয়ে বললাম — আরে ২৯ জানুয়ারি... আজ তো ২৬ তারিখ। মানে আর দু'দিন পরে আমাদের বইটি প্রকাশিত হবে, তাও আবার বইমেলার দ্বিতীয় দিনে। আমি তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। তা আমাদের আরেক লেখিকা অনন্যা এই খবরটি পেয়েছে? এতো কম সময়ে কি করে সব আয়োজন করবো? আর আপনিও কি এই কম সময়ে কলকাতায় এসে পৌঁছাতে পারবেন?

প্রশান্তবাবু আশ্বাস দিয়ে বললেন — আমি প্লেনের টিকিট কেটে নিয়েছি। আমি সেদিন দুপুরে বইমেলায় পৌঁছে যাব। গুণীজনেদের সমাদরের সব ব্যবস্থা আমি করে নেব... তোমরা দু'জন শুধু বই উদ্বোধনে কে কে আসবেন সেটার ব্যাপারে দেখেশুনে নিও। আর হ্যাঁ, পাবলিশার্সের সাথেও কথাও বলে নিও।

আমি আর অনন্যা এই অল্প সময়ে যতজনকে সম্ভব আমন্ত্রণ জানালাম। কেউ আসার আশ্বাস দিলেন। কেউ কেউ নিরাশ করলেন। আবার অনেকে বললেন সেদিন বাগদেবীর আরাধনার দিন, তাই আসতে পারবেন না। তবে আমরা আশার পথের পথিক, তাই সবটা ভালো হবে ভেবেই, তিনজনেই স্বল্প আয়োজন করলাম।

অবশেষে ২৯ জানুয়ারীর বিকাল বেলা আমাদের বই উদ্বোধনের শুভক্ষণ উপস্থিত হল। কিন্তু সমস্যা মাঝে মাঝে

বেড়ির মতো পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে। আমাদের সামনেও এক কঠিন সময় উপস্থিত হল। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার অযাচিত আগমনে শুরু হল বৃষ্টি। যার ফলে যাঁরা আমন্ত্রিত ছিলেন, তাঁরা কেউ এসে উপস্থিত হলেন না। আমাদের মনে শুধু একটাই বোধ জাগছে, মা সরস্বতীর আরাধনার পুণ্য লগ্নে মায়ের আশিস থেকে কি বঞ্চিত হব আমরা? বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল, বৃষ্টিটাও অবশেষে থামল। কিন্তু কি করবো? কি না করবো? এই সব ভাবছি আমরা। অবশেষে আমরা নিজেরাই নিজেদের বই উদ্বোধন করবো বলে স্থির করছি।

এমন সময় প্রশান্তবাবুর সামনে এক ভদ্রলোক এসে বললেন, "আপনি লেখক প্রশান্তবাবু না? আমি পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস। স্যরি, আমার আসতে একটু দেরী হয়ে গেল। আসলে আমার দুই বন্ধু আমার সাথে এসেছেন। ওনাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, তাই একটু দেরি হয়ে গেল আর কি... পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি হলেন আমাদের ওপার বাংলার লেখক শামসুদ্দিন শিশির মহাশয় আর ইনি হলেন ত্রিপুরার বিখ্যাত কবি জ্যাক ড্যানিয়েল। তা আপনাদের অনুষ্ঠান কি হয়ে গেছে?"

প্রশান্তবাবু মৃদু হেসে বললেন, "প্রকৃত চাঁদের হাট তো এখানে উপস্থিত হল এইমাত্র..."

এই বার ওনাদের হাত ধরে আমাদের এতোদিনের অপেক্ষার ফসলের উদ্বোধন করা হল। একরাশ নিরাশার

চাঁদের হাট

আকাশ থেকে মেঘ সরে গিয়ে খুশির তারা ঝিকিমিকি করে উঠল বইমেলার এই স্বর্ণাভ সন্ধ্যায়। এইভাবেই আমাদের ভাবনার বাইরে অর্থাৎ সব নিরাশার শেষে জ্বলে ওঠে আশার প্রদীপ। আনন্দের কথা এই যে, ২০২০ তে বইমেলা না হলেও, আমাদের বইটির প্রথম সংস্করণ প্রায় শেষ। তাই ভাবি, যিনি অলক্ষ্যে থেকেও সবসময় আমাদের ওপর লক্ষ্য রাখেন, আমরা কেন তাঁর প্রতি ভরসা রাখতে এত কুণ্ঠিত! ■

সবিনয় নিবেদন

'গুঞ্জন' কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা 'গুঞ্জন'-এ দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের 'ই-মেল'-এ (contactpandulipi@gmail.com) পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু'ট 'ফরম্যাট'-ই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি 'পাসপোর্ট সাইজ'-এর ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর **'পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)'** গোষ্ঠীতে অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: ফেব্রুয়ারী ২০২২ সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ১৫ই জানুয়ারি, ২০২২